একাদশ সংসদের যত অর্জন

চলতি একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত হলেও শেষ হতে যাচ্ছে এর অধিবেশন পর্ব। চলতি সংসদের শেষ অধিবেশন বসছে আজ রবিবার (২২ অক্টোবর)। ৫ কার্যদিবস চলে আগামী ২৯ অক্টোবর এ অধিবেশনটি শেষ হওয়ার কথা। পুরো দুই বছরের মতো কোভিড মহামারির মধ্যে সীমিত পরিসরে চলার মধ্য দিয়ে এবারের সংসদ শেষ হচ্ছে।

করোনা ছিলো পুরো বিশ্বের জন্যই এক নতুন অভিজ্ঞতা। সেসময় মাত্র দেড় ঘণ্টায় একটি অধিবেশন শেষ করা হয়েছে, যা ছিল দেশের ইতিহাসে সংক্ষিপ্ততম সংসদ অধিবেশন। সংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় নিয়মিত বিরতিতেই সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অনেকরকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনে এসব করতে হয়েছে। এবারের সংসদে অতীতের মতো ওয়াকআউট ও বিরোধী দলের সংসদ বর্জনও হয়নি। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রয়োজনীয় বেশকিছু আইন পাস হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে এই জাতীয় সংসদ। করোনা মহামারির কারণে প্রায় দুই বছর এই সংসদের কার্যক্রম ছিল অনেকটাই সীমিত। নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্যতম ছিলো অধিবেশনের শুরুতেই কোভিড টেস্টের বাধ্যবাধকতা। সর্বশেষ দুটি অধিবেশন ছাড়া করোনা পরবর্তী সবগুলো অধিবেশনেই সংসদ সদস্য, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়মিত কোভিড টেস্ট করেই সংসদ অধিবেশনে প্রবেশ করতে হয়েছে।

এবারের সংসদে দুটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২০ সালের ৮ নভেম্বর বসে বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা দিক নিয়ে ভাষণ দেন তৎকালিন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। সংসদ সদস্যরাও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে অধিবেশনে একটি সাধারণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংসদের খরচের বিলের পরিমান নিয়ে প্রতিবেদন হয় প্রতিবছরই। এবার বিলের পরিমাণ ছিলো অনেক কম। করোনাকাল এবং পরবর্তী সময়গুলোকে সংসদ অধিবেশনের কার্যদিবস তুলনামূলক হওয়ার হওয়ার কারণে একাদশ সংসদ আগের দুটি সংসদের তুলনায় কম দিন চলছে। সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া সংসদের ২৪তম অধিবেশনের হিসাব অনুযায়ী সংসদের মোট কার্যদিবস

হয়েছে ২৬২দিন। শেষ অধিবেশনে ৫ কার্যদিবস হলে সেটা দাঁড়াবে ২৬৭ দিনে।

এবার সর্বশেষ অধিবেশন পর্যন্ত ১৪০টি বিল পাস হয়েছে। সংসদ সচিবালয়ে আরো ২২টি বিল পেন্ডিং আছে। এর মধ্যে আর কোন বিল পাস হবে না বলে সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে। সব মিলিয়ে একাদশ সংসদে পাস হওয়া বিলের সংখ্যা প্রায় দেড়শ। এর আগে নবম সংসদে বিল পাস হয় ২৭১টি। আর দশম সংসদে বিল পাস হয়েছিল ১৯৩টি।

সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, চলতি সংসদে এখন পর্যন্ত ১৪০টি বিল পাস হয়েছে। কিন্তু এসব বিল পাসে বেশির ভাগ সংসদ সদস্যের ভূমিকা ছিল ‘হ্যাঁ’- ‘না’ ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিএনপি সংসদে থাকাকালে দলটির ২/৩ জনসহ ১২-১৩ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব আনতেন। বিএনপি পদত্যাগ করার পর এখন জাতীয় পার্টি, গণফোরাম ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে ৮-১০ জন সংসদ সদস্য বিভিন্ন বিলের ওপর সংশোধনী এনে থাকেন। তবে এতে বিলের মৌলিক কোনও পরিবর্তন হয় না।

সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২৪তম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে বলেছেন, ‘অক্টোবরে চলতি সংসদের আরেকটি অধিবেশন বসবে, সেটাই হবে শেষ অধিবেশন। এরপরই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে।’সংবিধান মোতাবেক সংসদের একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী অধিবেশন ডাকার বাধ্যবাধকতা আছে। সংসদের ২৪তম অধিবেশন গত ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফশিল কিংবা সাংবিধানিক সময়সীমার আগে ৬০ দিন সময় না থাকায় মাত্র ৩৭ দিনের মাথায় পরবর্তী (২৫তম) অধিবেশন ডাকেন রাষ্ট্রপতি।

প্রসঙ্গত, বিগত দশম সংসদের শেষ বৈঠক বসেছিল ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর। ঐ বছরের ৮ নভেম্বর একাদশ সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন এবং ৩০ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হয়।

গণমুখী ইশতেহার আসছে আওয়ামী লীগের

কী থাকছে এবার আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে? এনিয়ে গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার ছিল, দলটির ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির কাছে সাধারণ মানুষের প্রস্তাব পাঠানোর শেষ দিন। কমিটির আহবায়ক, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সংসদ সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক জানান, এরই মধ্যে বহু প্রস্তাব তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এখন চলছে যাচাই বাছাই। এর আগে গত ৩রা অক্টোবর উপ-কিমিটির পক্ষ থেকে ইশতেহারের জন্যে প্রস্তাব চেয়ে একটি গণ বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া হয়েছিল।

তৃণমূলের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া প্রসঙ্গে ড. রাজ্জাক বলেন, গণমানুষের দল আওয়ামী লীগের ইশতেহার কেবলমাত্র একটি দলীয় ইশতেহার নয়। এটি প্রকৃত অর্থে গোটা জাতির ইশতেহার। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি আওয়ামী লীগের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার প্রতিটি নির্বাচনী ইশতিহারে জাতিকে প্রদত্ত প্রতিটি অঙ্গীকার শতভাগ প্রতিপালন করেছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের প্রতিটি ইশতেহারেই সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদের বাইরে দীর্ঘমেয়াদি নানা উন্নয়নের পথনকশা ছিল। এর প্রতিটিই অত্যন্ত সুচারুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

তবে, দলটির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, এবারের ইশতেহার হবে স্মার্ট এবং গণমুখী। তারা বলছেন, স্মার্ট বাংলাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি দৃশ্যমান যে উন্নয়নগুলো হয়েছে তার মাধ্যমে আগামী দিনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। আগামী দিনের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানটাই হবে এবারের মূল প্রতিপাদ্য। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে শিল্পকারখানা স্থাপন করে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, মানুষের আয় বৃদ্ধি করা।

আওয়ামীলীগ গণমানুষের ইচ্ছার কথা জানতে আগ্রহী উল্লেখ করে আ্ওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির সদস্য সচিব ড. সেলিম মাহমুদ জানান, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী

লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেই জনগণের মতামত চাওয়া হয়েছে ।

তিনি আরও জানান, আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ইশতেহার দিয়েছিল। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইশতেহার ছিল “শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সবশেষ ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ শীর্ষক ইশতেহার ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ।

অত্যন্ত সফলতার সাথে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,আদালত,হাসপাতাল,ব্যবসায়িক কার্যক্রম সকল কিছুই আজ ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে। এতে করে জনগণের ভোগান্তি যেমন কমেছে,একই সাথে উন্নত বিশ্বের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ।

২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি সাফল্য দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। জঙ্গিবাদকে দমন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপি-জামাত সৃষ্ট রাজনৈতিক সহিংসতা দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফলতা দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ ।পাশাপাশি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সফলতার সাথে কাজ করেছে। দলীয় সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ অনুযায়ীও আওয়ামী লীগ সরকার কাজের মাধ্যমে ইশতেহারের পূর্ণতা দিয়েছে। পদ্মাসেতুর মত প্রকল্প দেশের অর্থায়নে বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগ। পাশাপাশি মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল, বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সারাদেশে অসংখ্য সড়ক-মহাসড়ক,সেতু,ওভারপাস নির্মাণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করেছে আওয়ামী লীগ।

সেই সময় পেরিয়ে ডিজিটাল যুগের মধ্যেই স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ধরে এগিয়ে চলার সময় এখন। সেই বিবেচনায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘গ্রাম হবে শহর’ স্লোগান থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ

নির্বাচনে দলের মূল স্লোগান হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি: প্রধানমন্ত্রী

পূজা শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সবার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বলব, আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি।

রবিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সবসময় উদার মনের, তারাও সব সময় অসম্প্রদায় চেতনাকে বিশ্বাস করে। যে কারণে আজকে আমাদের স্লোগান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সবাই আমরা ঠিকই এভাবে উৎসব পালন করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ’৭৫ পর বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে। ’৯২, ২০০১ ও তার আগে বার বার আঘাত এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিল, পাশে আছি।আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে সব ধর্ম-বর্ণের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থাৎ সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে সেটা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু ৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।’

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, সবি ধর্ম বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ করেন, সেটাই আমরা চাই। আইন-শৃঙ্খলা কর্মী থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক নেতারা থাকবে, যাতে কোনো ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। সেদিকে আমরা সতর্ক থাকবো। আমরা চাই, আপনারা ভালোভাবে পূজা উদযাপন করেন।

তিনি আরও বলেন, এ মাটির সন্তান সবাই। এই মাটিতে নিজ নিজ অধিকার নিয়ে সবাই বাস করবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সবাই একই যুদ্ধ করেছেন, এখানে সবার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আমরা সেই চেষ্টাই করি। আমরা চাইবো, আপনারও বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করুন।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, এখন ঘরে ঘরে খাবার আছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আছে, চিকিৎসা সেবা মানুষের কাছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ছোঁয়া, এটা মানুষের কল্যাণেই আমাদের কাজ। মানুষের কল্যাণ করাটাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।

ফিলিস্তিনে গনহত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত হামলা ও গনহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বর এলাকায় শহরের বিভিন্ন মসজিদের মুসুল্লী ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অংশগ্রহনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

হয়।
গাংনী উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও গাংনী দারুস সালাম জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-০২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন,গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম,গাংনী দারুস সুন্নাত জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ মহাসেন হাজী,মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা প্রমূখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপর একের পর এক হামলা করা হচ্ছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় শিশু কিশোর থেকে শুরু করে নানা বয়সী মুসলিম জনতা অংশগ্রহন করে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ইসরাইলি পণ্য বর্জনের ঘোষণা দেন বক্তারা। শেষে মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় দুর্গাপূজার উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় সার্বজনীন কালিমন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও সাবেক হারদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেন।
এসময় তিনি বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ধর্মের অজুহাতে অনেকে

নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার সাথে দেখেছেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহাবুদ্দিন, এম সবেদ আলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ঠান্ডু রহমান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি প্রকাশ কুমার ব্যাধ, সাধারণ সম্পাদক আতিক কুমার ব্যাধ। এছাড়া ব্যাধ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রধান বিধান কুমার ব্যাধ, অচিন্ত কুমার ব্যাধ, লালু কুমার ব্যাধ, শংকর কুমার ব্যাধ, সাগর, সঞ্জিত, অজয়, লিটন, প্রশান, কাঞ্জন, মিঠুন, সওদাগর, বিক্রম, রুবেল, আশিক, সাজিত, অজিত, রাহুল, মিঠুন, হৃদয়, নিশান প্রমূখ।

গণমাধ্যমকর্মীদের কল্যাণে কী করেছে আওয়ামী লীগ?

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের যুদ্ধপীড়িত জনগণের মনোবল চাঙ্গা রাখতে অনুপ্রেরণামুলক পরিবেশনা রেডিওতে প্রচার করা হতো। রেডিও এর মাধ্যমেই সাধারণ জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর জানতেন। এছাড়া বিশ্ব জনমত তৈরি করতে বাংলাদেশের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা বিশ্ববাসীর কাছে তুলেই ধরে গণমাধ্যম।

বাংলাদেশে একটা সময় গণমাধ্যম ও সরকার একে অন্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল । কিন্তু দিন দিন সরকার ও গণমাধ্যমের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। দূরত্ব বৃদ্ধিতে সরকারের যেমন দায় ছিল তেমনি দায় ছিল নির্দিষ্ট কিছু গণমাধ্যমের । বিশেষ করে ৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার পর দেশে গণমাধ্যম চাইলে অনেক কিছু করতে পারতো কিন্তু তারা তৎকালীন সামরিক সরকারের সাথে আপোষ করে নেয়। তাদের এই আপোষ করার মানসিকতাকে পুঁজি করে গণমাধ্যমের বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে সামরিক শাসক জিয়া, এরশাদ ও বিএনপি।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম শুরু থেকেই মিশ্র অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে। সাংবাদিকরা কেমন থাকবে এটা নির্ভর করে ক্ষমতায় কোন দল আছে তার উপর। সামরিক শাসনের সময় সাংবাদিকতা সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে। সার্বিক তথ্য উপাত্ত দেখলে জানা যায় অন্যান্য শাসনামলের চেয়ে আওয়ামী লীগের সময় সাংবাদিকরা বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

আওয়ামী লীগ সরকার সরকারে থাকুক কিংবা না থাকুক গঠনমূলক সমালোচনা মেনে নেয়। যা তাদের রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ। আওয়ামী লীগের সময় গণমাধ্যমের বিকাশ চোখে পরার মতো। সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের যে স্বপ্ন দেখছে তা বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। সরকার এবং জনগণের মাঝে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে গণমাধ্যম ।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল বিএনপি। এসময়ে সরাদেশে অন্তত ২০ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। আর ৪৫০ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন। শুধুমাত্র ২০০২ ও ২০০৩ সালের মধ্যে ১৫৮ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়৷ কুষ্টিয়ায় মানবকণ্ঠের এক সাংবাদিকের আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছিল৷ ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নেতৃত্বে হওয়া সাংবাদিকদের এক সমাবেশে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছিল৷ বিএনপি আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল একুশে টিভি, এই চ্যানেলের চট্টগ্রাম স্টেশনে ছাত্রদলের ক্যাডাররা ঢুকে সাংবাদিকদের পিটিয়েছিলো। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বাসসের ৪০ জন সাংবাদিকের চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশনের অনেক সাংবাদিককে চাকুরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিলো।
সেসময়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘বিএনপির আমলে ২০০১ সালে দক্ষিণাঞ্চলে কোনো সাংবাদিক যেতে পারতো না। কোনো সংবাদ পরিবেশন করতে পারতো না। একমাত্র জনকণ্ঠ পত্রিকা জোর করে কিছু সংবাদ পরিবেশন করতো। তাদের কিছু সাংবাদিক গোপনে যেত এবং তথ্য আনতো। পরবর্তীতে তাদের দেখাদেখি অনেক পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন শুরু করে। এটা হলো বাস্তবতা। গৌরনদী থেকে একটা গ্রুপ কোটালিপাড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে ৭১’ এর মতো। বিএনপির নির্যাতনের সঙ্গে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেই নির্যাতন চালিয়েছিল শুধু সেটার সঙ্গেই তুলনা করা যায়।’

শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশে মানবাধিকার বিষয়ক সাংবাদিক হিসেবে বহু বছর ধরে লেখালেখি করছেন। সরকার কর্তৃক বেআইনি আক্রমণ বলে অভিহিত করা হলেও ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে তাকে দুবার গ্রেপ্তার করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০১ সালের নভেম্বরে তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন। তিনি ২০০১-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলার তদন্ত করছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করলে সরকার তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং “সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার” অভিযোগ আনে। অতঃপর ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি জামিনে মুক্তি পান। পরের মাসে ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে তার জন্য আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বোমা নিক্ষেপ করা হলে এক প্রত্যক্ষদর্শী নিহত হয়।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বাসসের ৪০ জন সাংবাদিককে বিনা নোটিশে চাকরিচ্যুত করেছিল, বিএনপির আমলেই খুলনায় হুমায়ন কবির, মানিক, হারুনসহ অনেক সাংবাদিক খুন হয়েছেন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জিয়া-খালেদাসহ যারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলো সবার আমলেই সাংবাদিকরা নির্যাতিত এবং খুন হয়েছেন। তাদের সময় সাংবাদিকদের কোনো স্বাধীনতা ছিলো না।

২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। যুগান্তকারী এ উদ্যোগের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে গণমাধ্যমকর্মীসহ আপামর জনসাধারণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার একটি আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি-বেসরকারি অফিসে আইনে বেঁধে দেয়া সময়সীমার মধ্যে সাংবাদিকদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য দিতে বাধ্য। এভাবে আইনটি এসব অফিসের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

দুর্নীতি দমনে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করতে সরকার পেনাল কোড সংশোধন করেছে। সংশোধিত পেনাল কোডের অধীনে সম্পাকদের বিরুদ্ধে কোনো মানহানি মামলায় আদালতের সমন ছাড়া শুধু পুলিশি ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা যায় না। এ ধরনের আইনি সুরক্ষা দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে ভূমিকা রাখছে। সাংবাদিকরা এখন একেবারে নির্ভয়ে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সাংবাদিক, লেখক ও ব্লগারদের ওপর কুচক্রীমহল, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও জঙ্গিদের হামলার ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাগ্রহণের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের ওপর এ ধরনের হামলা অনেক কমে এসেছে। পত্রপত্রিকা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সংবাদপ্রকাশের প্রেক্ষিতে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। সংবাদপত্রের মালিকরা বিদেশ থেকে বিনাশুল্কে নিউজপ্রিন্ট ও অন্য প্রিন্টিং সামগ্রী আমদানি করতে পারেন।

সাংবাদিকদের ওয়েজবোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী বেতন-ভাতা দিয়ে থাকেন মালিকরা। সরকার, সাংবাদিক ও মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ইতোমধ্যে নবম ওয়েজবোর্ড গঠন করা হয়েছে। সরকার বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর সাংবাদিক, ক্যামেরাপারসন ও অন্য সহযোগী কর্মীদের ওয়েজবোর্ডে অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় গণমাধ্যমকে আরও গণমুখী করতে জাতীয় অনলাইন নীতিমালা অনুসরণে এ পর্যন্ত ৮৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং দেশের প্রতিষ্ঠিত ৯২টি পত্রিকার অনলাইন নিউজ ভার্সনকে অনুমোদন দিয়েছে। তথ্য অধিদফতর মন্ত্রণালয় অনুমোদিত এসব অনলাইন নিউজ সার্ভিসের নিবন্ধন তদারকি করছে। এ ধরনের আরও অনলাইন গণমাধ্যম অনুমোদন দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এসব অনলাইন গণমাধ্যম দেখভালের দায়িত্বে থাকবে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ অনুসরণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রতিষ্ঠিতব্য স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন।

সরকারের গণমাধ্যমবান্ধব নীতির সুবাদে সারাদেশে বিপুল সংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী দেশে মিডিয়াভুক্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা সাতশোর বেশি। এদের মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ৫৬০টি, যার মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ২৫৫টি। শেখ হাসিনার সরকার ঘোষিত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ দেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। রাষ্ট্রপরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি বিটিভি ওয়ার্ল্ড, বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র (সিটিভি) ও সংসদ টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিটিভির অনুসরণে অন্যসব বিভাগে পর্যায়ক্রমে টিভিকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি সরকার এ পর্যন্ত ৪৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২৭টি এফএম বেতার ও ৩১টি কমিউনিটি বেতারকে লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর মধ্যে

৩১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২২টি এফএম বেতার ও ১৭টি কমিউনিটি বেতারকেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রচারে রয়েছে এবং অন্যরা সম্প্রচারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে দূরদর্শন ফ্রি ডিসের মাধ্যমে সারা ভারতে সম্প্রচার করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর উৎক্ষেপণ দেশের গণমাধ্যম অঙ্গনকে শক্তিশালী করেছে। দেশে টিভি চ্যানেলগুলো এখন অনেক কম খরচে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপেণ করা হলে এ সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে।

দেশে ক্রমবর্ধমান গণমাধ্যম অঙ্গনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পেশাগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা বিভিন্ন মিডিয়া হাউজে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে ২০১৪ সালে সরকার বাংলাদেশ সিনেমা এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে রাজধানীর সার্কিট হাউজ রোডে ১০৪ কোটি ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৬ তলাবিশিষ্ট তথ্যভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে অত্যাধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সহায়তা প্রদানকারী শীর্ষ সরকারি সংস্থা- তথ্য অধিদফতর সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে বিভাগীয় অফিস স্থাপন করছে। এর মাধ্যমে সকল বিভাগে তথ্য অধিদফতরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া- উভয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা তাদের নিজেদের কর্মস্থলে চাকরির অনিশ্চয়তায় ভোগেন, আর তাও স্বাধীন গণমাধ্যমের জন্য হুমকি। তাদের চাকরির এ অনিশ্চয়তা দূর করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রণয়ণ করতে যাচ্ছে গণমাধ্যমকর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন যা বর্তমানে অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন গণমাধ্যমবান্ধব বর্তমান সরকারের আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

সরকারি অনুদানে পরিচালিত এ ট্রাস্টের আওতায় ২০১১-১২ সাল থেকে পাঁচ হাজার ২৬৩ জন অসচ্ছল সাংবাদিককে ১৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

করোনা মহামারিতেও সাংবাদিকদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। করোনাভাইরাস মহামারিতে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি সাংবাদিক পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে মোট তিন কোটি ৬৬ লাখ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদান হিসেবে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেন, যা বর্তমানে বিতরণ করা হচ্ছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও রেমিট্যান্স: দৃষ্টিভঙ্গি এবং চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশ গত কয়েক দশক ধরে একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই রূপান্তরের পেছনে অন্যতম চালিকাশক্তি হল বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে রেমিট্যান্স প্রবাহ।

প্রবাসী শ্রমিকদের অর্জিত অর্থ এবং তা নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ফলে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে । বিদেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে।

তারা যে অর্থ দেশে পাঠায় তা দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মাথাপিছু আয় এবং

মোট জিডিপিও বৃদ্ধি পায়। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী আয়ের অর্থ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিশুর পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে।

বিভিন্নি দেশে বসবাসরত রেমিট্যান্স যোদ্ধারা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ হাজার ৮২০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন, যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। করোনা মহামারির কারণে রেমিট্যান্স কমে যাবে বলে ধারণা করা হলেও তা হয়নি। সরকারের নানামুখী তৎপরতার কারণে প্রবাসীদের একমাত্র ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে হয়। যার ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে সব মিলিয়ে প্রবাসী আয় এসেছিল প্রায় ২ হাজার ৪৭৮ কোটি ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ বেশি।

এই তহবিলগুলি প্রায়শই স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আবাসন এবং ছোট ব্যবসায় বিনিয়োগের মতো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, রেমিট্যান্স পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন সময় প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্দাদেরকে, হুন্ডির পরিবর্তে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠাতে এবং দেশে বিনিয়োগ করতে আহ্বান করেছেন। প্রবাসী আয় বৃদ্ধিপেলে ব্যবসার বৃদ্ধি ঘটবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রসার ঘটবে যা বাংলাদেশের সামগ্রীক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকেও শক্তিশালী করবে যা স্থানীয় মুদ্রায় স্থিতিশীলতা প্রদান এবং বাণিজ্য ঘাটতি মোকবেলায় সহায়তা করবে।

রেমিট্যান্স নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি আশীর্বাদ। তবে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জও রয়েছে যা মোকাবেলা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং রেমিট্যান্স যেন বৈধ পথে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আরেকটি চ্যালেঞ্জ রেমিট্যান্স তহবিলের কার্যকর ব্যবহার। এই তহবিলগুলি অর্থনীতির উত্পাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি সঞ্চয়কে উৎসাহিত করা, আর্থিক সাক্ষরতার প্রচার করা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ছোট ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া রেমিট্যান্সের ইতিবাচক প্রভাবকে সর্বাধিক করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

টেকসই উন্নয়নের জন্য রেমিট্যান্সের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ বেশ কিছু কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রথমত, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক। কর্মশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, বাংলাদেশ নিশ্চিত করতে পারে যে তার প্রবাসী শ্রমিকরা বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরি নিশ্চিত করতে পারে, যার ফলে রেমিটেন্স বৃদ্ধি পায়। তদুপরি, দক্ষ শ্রমিকরা তাদের ফিরে আসার পরে দেশের অর্থনীতিতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখার সম্ভাবনা বেশি।

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করতে হবে যোতে করে রেমিট্যান্সের টাকা দেশীয় বিনয়োগে প্রভাব রোখতে সক্ষম হয়। অনেক রেমিট্যান্স গ্রহণকারী পরিবার তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে চায়। তাদের আর্থিক সংস্থান, মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম এবং বাজারের সংযোগে অ্যাক্সেস প্রদান করা তাদের সফল উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দিতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এসএমই) সমর্থন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে।

তৃতীয়ত, দেশের আর্থিক অবকাঠামো শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেমিট্যান্স লেনদেনের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহারে উৎসাহিত করা স্বচ্ছতা বাড়াতে পারে, খরচ কমাতে পারে এবং তহবিলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কাটানোর অন্যতম সহজ উপায় রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো। আর বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে প্রবাসীদের জন্য রেমিট্যান্স পাঠানো সহজ করতে হবে। তবে সুবিধাভোগীদের কাছে তা নিরাপদে ও তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্লাটফর্মই হতে পারে সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ, যেমন মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমগুলি, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিতে সহজে অ্যাক্সেসের সুবিধা দিতে পারে।

সর্বশেষ, সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ অভিবাসী শ্রমিকদের পরিবারের মুখোমুখি হওয়া আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলিকে প্রশমিত করতে পারে। সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী রেমিট্যান্স গ্রহণকারী পরিবারের সামগ্রিক যেমন উন্নত করতে পারবে টিক তেমনি, দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র ভেঙ্গে এবং আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

(UDC)

UDC (PDC) (CDC), (SDC) (EDC)

(ITU) (WSIS)

তাদের দক্ষ করে তুলতে হবে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। তাহলে অভিবাসী শ্রমিকরা শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন পাবেন— রেমিট্যান্স বাড়বে। রেমিট্যান্স বাংলাদেশের জন্য যে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে; সরকার রেমিট্যান্স খাতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাতকে আরো প্রসারিত করতে পারে।

লেখক: প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

যাদের নামে ভিসানীতির অপপ্রচার, তারাই যুক্তরাষ্ট্রে

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাদের ওপর ভিসানীতি আরোপ করা হয়েছে সেই নামগুলো দেশটির পক্ষ থেকে প্রকাশ না করা হলেও সামাজিক মাধ্যমে ঘুরপাক খায় বিভিন্ন ব্যক্তির নাম সম্বলিত তালিকা। অথচ তাদের অনেকেই অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। গুজব রটানো হয়েছিল বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নানের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রত্যাখিত হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল – গত শনিবার (১৪ অক্টোবর) তিনি স্ত্রীসহ সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্র গেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে দেখা যায়, ভিসা নীতিকে কেন্দ্র করে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি গোষ্ঠী। এর মধ্যে বিএনপি এবং তাদের অঙ্গসংগঠনের নামে চালু থাকা পেজ এবং বিভিন্ন গ্রুপ থেকে এসব গুজব পোস্ট করা হচ্ছে। সেখান থেকে কপি করে সেগুলো ফেসবুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের অনুসারীরা। দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন ফেসবুক পেজ এবং আইডি থেকে ছড়ানো হচ্ছে অপপ্রচার।

ভিসা নীতি ঘোষণার পর অপপ্রচারকারিদের তৈরি তালিকায় নাম আসে সাবেক ও বর্তমানসহ কয়েকজন প্রধান বিচারপতির, বিচারপতির, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ বেশ কয়েক জন কমিশনার, ব্যবসায়ী মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম। তবে দেখা গেছে, তাদের

অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে এসেছেন।

অপপ্রচার থেকে মুক্তি পায়নি খোদ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নানের ছেলে শেখ লাবিব হান্নান। তাকে নিয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর একটি অজ্ঞাত ওয়েব সাইটে নিবন্ধ লেখা হয় ভারতীয় সাংবাদিক চন্দন নন্দির নামে। সেখানে অজ্ঞাত সুত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়- ‘যুক্তরাষ্ট্রে পড়ুয়া লাবিব হান্নানকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। হেডলাইনে বড় করে বলা হয়- ‘মার্কিন ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরু, বিমানবাহিনী প্রধানের ছেলে দেশে ফেরত’। অথচ লাবিব হান্নান লেখাপড়া করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-তে। তিনি বর্তমানে একটি বহুজাতিক তামাক প্রস্তুতকারী কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। চন্দন নন্দির নামে ছাপানো ওই লেখার প্রতিবাদ শুরু হলে প্রকাশের কয়েকঘন্তা পর তা সরিয়ে ফেলা হয়। তবে সেটির স্ক্রিনশট নিয়েও অপপ্রচার চালান কয়েকদিন ধরে।

এরপর একই লেখক আরেকটি লেখার সূত্র ধরে চালান হয় আরেকটি অপপ্রচার। চন্দন নন্দির নামে আরেকটি লেখা একই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন – যুক্তরাষ্ট্র – কানাডা সম্প্রতি বিমান বাহিনী প্রধানের ভিসা প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশের জন্য হেলিকপ্টার কেনার উদ্দেশ্যে সশরীরে পর্যবেক্ষণ করতে ভিসার আবেদন করেছিলেন তিনি।

অপপ্রচারকারিরা এর সঙ্গে যুক্ত করেছে – বিমান বাহিনী প্রধান চিঠি দিয়ে ভিসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। যদিও এমন কিছুই ঘটেনি। বিএনপি’র বিভিন্ন নেতা এবং নেত্রী এই গুজব নিয়েও অপপ্রচার চালিয়েছেন সামাজিক মাধ্যম এবং ইউটিউবে। গত শনিবার বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। এক সফরসঙ্গী ও স্ত্রীসহ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। সফরের অংশ হিসেবে বিমান বাহিনীর দুটি সি-১৩০ পরিবহন বিমানের নিরীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের (পিডিএম এবং ‘সি চেক’) কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন বিমানবাহিনী প্রধান। সরকারি সফর শেষে ২১ অক্টোবর বাংলাদেশে ফিরবেন তিনি।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এমন কুৎসা রটনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ ফেসবুকে লিখেছেন- বাংলাদেশ বিরোধী গুজবকারীদের মুখে ছাই দিয়ে বিমান বাহিনী প্রধান এখন নিউইয়র্কে!

গত সেপ্টেম্বর মাসে ফেইসবুক, ইউটিউব এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দেশবিরোধীচক্র গুজব ছড়িয়েছিল বিমান বাহিনী প্রধানের আমেরিকা ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আবার কেউ কেউ লিখেছেন- বিএনপি জামায়াত পন্থী অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা অখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক চন্দন নন্দীর রেফারেন্স দিয়ে বিমানবাহিনী প্রধানের মার্কিন ভিসা ব্যানের গল্প প্রচার করছিলো ।

ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যর মেজরিটি দল শিবিরকে চায় কেন?

ছাত্রদলের নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যে যুক্ত হতে চায় ছাত্রশিবির। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জামায়াতের এই সংগঠনটি ছাত্র ঐক্যে যুক্ত হওয়ার জোরালো তৎপরতা শুরু করেছে। সূত্র বলছে, ঐক্যের কিছু কিছু সংগঠন চায় শিবির তাদের সাথে যুক্ত হোক। কেননা মাঠের আন্দোলনের জন্য শিবিরকে তাদের লাগবে বলে তারা মনে করে। শিবির কেন লাগবে প্রশ্নে বিশ্লেষকরা বলছেন, সাংগাঠনিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় শিবির থাকলে তারা রাস্তার আন্দোলন জোরালো করতে পারবে বলে মনে করছে। কিন্তু এটা ভুল কৌশল। কেননা জামায়াত বিএনপিকে সাথে নিলে তারা জনসমর্থন হারাবে।

ভোটের অধিকার, সন্ত্রাস-দখলদারমুক্ত নিরাপদ ক্যাম্পাস, সর্বজনীন শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ১৫টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য’ আত্মপ্রকাশ করে। চলতি বছরের জুন-জুলাইয়ে ছাত্রদের সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রদল, ছাত্র ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন কাজ শুরু করে। গত আগস্টে প্রক্রিয়াটি একটি গঠনের মধ্যে আসে। এতে রাখা হয়নি ছাত্রশিবিরকে।

ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যের ১৫টি সংগঠন হলো— জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র অধিকার পরিষদ, ছাত্রলীগ (জেএসডি), গণতান্ত্রিক ছাত্রদল (এলডিপি), নাগরিক ছাত্র ঐক্য, জাগপা ছাত্রলীগ, ছাত্র ফোরাম (গণফোরাম, মন্টু), ভাসানী ছাত্র

পরিষদ, জাতীয় ছাত্রসমাজ (কাজী জাফর), জাতীয় ছাত্রসমাজ (বিজেপি-পার্থ), জাগপা ছাত্রলীগ (খন্দকার লুৎফর), ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ, বিপ্লবী ছাত্র সংহতি এবং রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন।

ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যের একজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘ছাত্রশিবির শুরু থেকেই আমাদের এখানে ঢুকতে চায়। এটার কৌশল হিসেবে তারা কয়েকটি সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের চাপ প্রয়োগ করছে। কীভাবে শিবিরকে এই ঐক্যে নেওয়া যায়, শিবির ছাড়া ছাত্র ঐক্য কাজ করতে পারবে না। তারা প্রভাবিত করতে চেষ্টা করছে।’

কেন অন্য সংগঠনগুলোর মনে হয় তাদের সাথে শিবিরকে লাগবে জানতে চাইলে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘বিএনপি কখনোই জামায়াত বা তার অঙ্গসংগঠনকে ছাড়তে পারবে না। তারা এটা করতে চায় না। এই সংগঠনগুলোর আদর্শ জন্ম পথ সব এক, আমি এদের একই মায়ের পেটের সহেদর হিসেবে দেখি। ফলে কখনও বাদ দিয়েছে ◌িএমনটা নয়। বরং তারা অপ্রকাশ্যে কিছুদিন থেকে মানুষের সমবেদনা জোগাড় করতে চেয়েছিলো।’

গত ১১ অক্টোব ছাত্রশিবিরের ঝটিকা মিছিল থেকে সংগঠনটির ১২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয় ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য। মূলত সেদিন থেকেই এই বিষয়টি জোরেশোরে উঠতে শুরু করে। বিবৃতিতে কাদের সাক্ষর ছিলো সেটা দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায় কারা শিবিরকে এই ঐক্যে যুক্ত করতে যায়। সাক্ষরদাতারা হলেন, ছাত্র ঐক্যের সমন্বয়ক রাশেদ ইকবাল খান (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছাত্রদল), মশিউর রহমান রিচার্ড (সভাপতি-ছাত্র ফেডারেশন) ও আরিফুল ইসলাম আদীব (সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র অধিকার পরিষদ)।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বদলে

যাচ্ছে হাওর কৃষি

সবুজে ঘেরা শস্য-শ্যামল প্রাণের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। আবার নদীর দেশ, হাওর-বাওড় বা ভাটির দেশও বাংলাদেশ। ভাটি বাংলার অপরূপ রূপে মাতিয়েছে যেন বাংলার প্রকৃতিকে। দিগন্ত বিস্তৃত হাওর এবং তাদের চৌহদ্দি মিলে আমাদের এই ভাটির বাংলা বা হাওর অঞ্চল।

বাংলাদেশের ভূ-বৈচিত্র্যের এক অনন্য দিক হচ্ছে হাওর। বিশাল ভূ- গাঠনিক অবনমনের সাথে ছোট ছোট নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা আর বিস্তীর্ণ সীমাহীন বিল মিলিয়ে গঠিত হয়েছে এই হাওরাঞ্চল। প্রধানত বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই হাওরসমূহের দেখা মেলে।

হাওরের নামগুলোও বেশ আকর্ষণীয়। টাঙুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, শনির হাওর, টগার হাওর, মাটিয়ান হাওর, দেখার হাওর, হালির হাওর, সানুয়াডাকুয়া হাওর, শৈলচকরা হাওর, বড় হাওর, হৈমান হাওর, কড়চা হাওর, ধলা পাকনা হাওর, আঙ্গারখালি হাওর, নখলা হাওর, চন্দ্রসোনার থাল হাওর, ডিঙ্গাপুতা হাওর এরকম আরও কত বিচিত্র নামের হাওর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাটির এসব জেলায়।

হাওরের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পরিবর্তিত হয়ে ফুটে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে। বর্ষায় হাওরে পানিরাশির ব্যাপ্তি এত বেশি থাকে যে দেখে মনে হয় সমুদ্র। এই সময়ে হাওরের হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য আর দিগন্ত জোড়া অথৈ জলরাশি যে কারোর মন উদাস করে দেয়।

উদ্দাম ঢেউয়ের অবিরাম মাতামাতি আর মন মাতাল করা উদাসী হাওয়া যেন ভুলবার নয়। হাওরে নৌকা ভ্রমণের সুখস্মৃতি যিনি জীবনে একবার পেয়েছেন তিনি বারবার ফিরে যাবেন হাওরের টানে। স্মৃতি আহরণের এই তৃষ্ণা জাগরূক থাকে আমৃত্যু। বাংলার আদি ও আসল রূপ অপরূপ হয়ে ফোটে হাওরেই।

হাওর পাড়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনও হাওর দ্বারা প্রভাবিত। এই অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য, কৃষি সবকিছু হাওরকেন্দ্রিক। তাই এসব ক্ষেত্রে হাওর এলাকার সঙ্গে দেশের অন্যান্য এলাকার বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো।

বাংলাদেশের হাওর এলাকার গঠন ও প্রভাব—

বাংলাদেশের বিশাল অংশ হাওর এলাকা হিসেবে পরিচিত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাক্ষণবাড়িয়া অর্থাৎ এই সাত জেলার প্রায় ৮ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তন নিয়ে হাওর অঞ্চল গঠিত, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-পঞ্চামাংশ।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে ছোট-বড় ৩৭৩টি হাওর রয়েছে। হাওর এলাকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক বসবাস করে যা মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ। বাংলাদেশে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে হাওরের রয়েছে বিশাল প্রভাব। মূলত ধান চাষ, মৎস্য চাষ, হাঁস চাষ, পানি ফলের চাষ, ইত্যাদি এই অঞ্চলের মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর, বছরে ধান উৎপাদন হয় ৫.২৩ মিলিয়ন টন যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাওরে শস্য নিবিড়তা বা ক্রপ ইনটেনসিটি হচ্ছে ১৪৭ শতাংশ। জিডিপিতে হাওরের অবদান ০৩ শতাংশ-এর ২৫ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। হাওর এলাকায় ৩৪ শতাংশ পরিবার প্রান্তিক কৃষক, ৫ শতাংশ পরিবার জাতীয় পর্যায়ের অনেক নিচে এবং ৫১ শতাংশ পরিবার ছোট কৃষক (জাতীয় ৪৯.৫ শতাংশ)। তাছাড়া, ২৮ শতাংশ লোক অতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কৃষি ও কৃষিজীবী মানুষের জীবন জীবিকার ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অতি বৃষ্টি, বজ্রসহ বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে আগাম ও নাবি বন্যা কৃষকের জন্য নিত্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত পাহাড়ি ঢলে নদী ভরাট হওয়ায় নদীতে পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

এপ্রিল মাসে বোরো ধান সংগ্রহের সময় হঠাৎ ভারী বৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাওর অঞ্চল প্লাবিত হয়ে নিমিষেই ব্যাপক ফসল হানি ঘটে। সদ্য বাড়বাড়ন্ত ফসল হারিয়ে কৃষকের মর্মান্তিক আহাজারি হাওর ছাড়িয়ে দেশের অন্য প্রান্তেও অনুরণিত হয়।

বোরো ধান সংগ্রহের মৌসুমে কৃষকের আতঙ্ক ও উদ্বেগের শেষ থাকে না এই ভেবে যে কখন তার শ্রমেঘামে ফলানো সোনার ধান পাহাড়ি ঢলে বিলীন হয়ে যাবে। প্রকৃতির কাছে কাতর মিনতি আর ক’টা দিনের যাতে ধান কাটার উপযুক্ত হয়। অনেক সময় কৃষকরা ঢল আসার আগেই আধ-পাকা ধান

কেটে ঘরে তোলতে চায় কিন্তু কৃষি শ্রমিকের অপ্রাপ্ততা ও অধিক মজুরির কারণে তাও সম্ভব হয় না।

হাওর এলাকার কৃষির উন্নয়ন যাত্রা—

হাওর এলাকার প্রান্তিক কৃষকের কথা চিন্তা করে হাওরকেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনা প্রথম শুরু হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে। হাওর ও জলাভূমি এলাকার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয় কিন্তু হাওর এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

১৯৮২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বোর্ডটি বিলুপ্ত করা হলে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। হাওর এলাকার মানুষ তাদের শিক্ষা- দীক্ষা থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পিছিয়ে পড়ে। জাতির পিতার পর হাওর এলাকার উন্নয়নের সুবাতাস আবার আসতে থাকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে।

১৯৯৮ সালের ৩ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ জেলার মিটামইনে এক জনসভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়নে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের ১০ জানুয়ারি দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড’ এবং বোর্ডের ‘কার্যনির্বাহী কমিটি’ গঠন করা হয়।

এরপর, হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ১৭ নভেম্বর হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তর ঘোষণার নির্দেশ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় হাওর এলাকার জনজীবন, জীবিকা, পরিবেশ-প্রতিবেশসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০১২ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত মোট ২০ বছর মেয়াদি একটি হাওর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুকনো ও বর্ষায় হাওরাঞ্চলের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বহুমুখী ও পরিকল্পিত উপায়ে উদ্যোগ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিলে খুলে যাবে এতদঅঞ্চলের অপার সম্ভাবনার দুয়ার।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে হাওরের কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন—

হাওর অঞ্চলের কৃষি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেকটা ভিন্নতর। হঠাৎ পাহাড়ি ঢল এবং অতি বৃষ্টিজনিত বন্যা আসার পূর্বে বোরো ধান সংগ্রহ ছিল এই অঞ্চলের কৃষির প্রধানতম সমস্যা। এছাড়া হাওর অঞ্চলে শ্রমিক সংকট নিরসনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই এহেন পরিস্থিতিতে যদি ফসল রোপণ, কাটা ও তোলার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার করা যায় তবে এই সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে।

বিষয়টি আমলে নিয়ে হাওরের কৃষিকে টেকসই করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বর্তমান সরকার বেশকিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রচলিত শ্রমিকের মাধ্যমে পরিচালিত ফসল রোপণ, কর্তন, মাড়াই এবং নির্বিঘ্নে ঘরে তোলার মতো কৃষিকাজ প্রতিস্থাপিত করার লক্ষ্যে শক্তিচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে এখন সরকার সারাদেশে ৫০ শতাংশ এবং হাওর ও উপকূল এলাকায় ৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিচ্ছে।

যন্ত্রপাতির দাম একটু বেশি হওয়ার কারণে সরকার ঋণ সুবিধাও সম্প্রসারণ করেছে-যাতে কৃষকরা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সহজে তা কিনতে পারে। ফলে ৩ বছরে শুধু ধান কাটতে কম্বাইন হারভেষ্টারের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ২০০০ শতাংশ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে গত বোরো মৌসুমে নেত্রকোনায় ৭১ শতাংশ, ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় ৬০ শতাংশ, হবিগঞ্জে ৫২ শতাংশ, মৌলভীবাজারে ৫০ শতাংশ এবং সুনামগঞ্জে ৪১ শতাংশ জমির ধান কম্বাইন হারভেষ্টার দিয়ে কাটা হয়েছে, যা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের বোরো ধান উৎপাদনে শ্রমিকের যে সংকট রয়েছে, তা অনেকটা কেটে যাচ্ছে এবং সময়মতো সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে বলে উৎপাদিত ধান নষ্টও হচ্ছে না।

আর যন্ত্রের ব্যবহারে খরচ কম হওয়ায় কৃষকও ধান উৎপাদন করে ভালো দাম পাচ্ছেন। পাশাপাশি কৃষির একেকটি যন্ত্র একেকজন কৃষককে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলেছে। এভাবে সরকারের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি হাওর অঞ্চলের কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকের জীবনমান বৃদ্ধিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে ক্রমেই হাওর কৃষিতে বাড়ছে ঝুঁকি। এইসব ঝুঁকি মোকাবিলা করে কৃষিকে লাভজনক করতে কৃষি কাজের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি। কৃষি কাজের আধুনিকীকরণ অনেকাংশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ওপর নির্ভরশীল যা কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন নিয়ে হাওর উন্নয়ন বোর্ডের গোড়াপত্তন করেছিলেন তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনারবাংলা বিনির্মাণে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছেন।

হাওরে সমন্বিত কৃষির যান্ত্রিকীকরণকে এগিয়ে নিতে এবং কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দ করেছেন। এইসব কর্মসূচিতে সরকার যে টাকা দিচ্ছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

স্থানীয় পর্যায়ে কৃষিযন্ত্রপাতিসমূহ মেরামতের জন্য প্রশিক্ষিত সার্ভিস প্রোভাইডার তৈরি কৃষিযান্ত্রিকীকরণকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রয়োজনে তাদের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

সর্বোপরি, হাওরের স্থিতিশীল ইকোসিস্টেমকে ব্যাহত না করে বর্তমান সরকারের পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হাওর কৃষিকে লাভজনক, বানিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে কৃষিসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

লেখক: পরিচালক, আইকিএসি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।